আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বর্ষবরণ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩০

শেষ হয়ে এল পুরনো বছর। নতুনের জন্যে অপেক্ষার পালা এখন। অনেক হওয়া না হওয়া, পাওয়া না পাওয়ার হিসেব নিকেশ চুকিয়ে এসে গেল নতুন বছরকে আবাহনের মুহূর্ত। আসুন, বাংলা স্ট্রিট-এর তরফে আমরাও সেজে উঠি নতুনকে আবাহনের মন্ত্রে। চলার পথ সুগম হোক আগামীর আলোয়।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

ভালোয় মন্দে মিলেমিশে আরো একটা বছর তাহলে কেটে গেল।

এই একটা বছরে আমরা কমবেশি অনেক ভালো খবর যেমন বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরেছি , তেমনি দুঃসংবাদে বন্ধুদের সঙ্গে এক সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি আশাহত বহু বেদনাই। বাংলাস্ট্রিট কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকেনি ঠিক কথা, তবে আমরা চেয়েছি সব সময়েই সদর্থক বার্তা নিয়ে পাঠক সমীপে হাজির থাকতে। বিশেষ করে এরকম একটা সময়ে, যখন দহনকাল প্রতিনিয়ত নানা চেহারায় আমাদের ঘরের দরজায় এসে কড়া নেড়ে যাচ্ছে বিরামহীন। বেঁচে থাকার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই লাগাতার লড়াই আজ আমাদের নিত্য সঙ্গী। 'বাংলাস্ট্রিট' পথচলার সেই প্রথম দিনটি থেকে এই বাংলা থেকে শুরু করে বিশ্বের যে কোণেই মানুষ এই জীবন সংগ্রামে সামিল, সেইখানেই সেই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এবং তার অঙ্গীকার যতদিন তার পথচলা বজায় থাকবে , সে এই লড়াইয়ে সামিল থাকবে সার্বিক অর্থেই ।

নতুন বছর পাঠকদের ভালো কাটুক। শুভ হোক, নির্বিঘ্ন হোক সকলের পথচলা। সবাই ভালো থাকুন। আগামী দিনগুলিতেও বাংলাস্ট্রিট আগেকার মতোই হয়ে থাক আপনার নিত্যসঙ্গী।

সূচিপত্র

রাজবাড়ির নতুন বছরের মহাভোজ Page 4
শোভন চক্রবর্তী

পয়লা বৈশাখ : কাল ও আজ Page 6
সিদ্ধার্থ সেন

পয়লা বৈশাখ Page 9
অনিমেষ দাশ

বঙ্গাব্দ : একটি আলোচনা Page 13
অর্যমা

পয়লা বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ Page 19
আদিত্য ঠাকুর

চাই সমাজের সব স্তরে প্রকৃত সচেতনতা Page 24
নিজস্ব প্রতিবেদন

মনের খবর রাখেন তো ! Page 27
মিতুল চৌধুরী

জোড়া অস্কার ভারতের Page 30
অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত : সিরিজ জয় এবং… Page 33
প্রসেনজিৎ মজুমদার

কলকাতায় শুরু হল ডায়াহাা‌েমের যাত্রা Page 37
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

রাজবাড়ির নতুন বছরের মহাভোজ

শোভন চক্রবর্তী

সামনেই পয়লা বৈশাখ। বাংলা নতুন বছরের শুরু। জমজমাট ভুরিভোজ ছাড়া বাঙালির সব উৎসবই অসম্পূর্ণ। এক সময় এই নববর্ষকে ঘিরে বনেদি পরিবারগুলোতে বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে দেদার ভুরিভোজ আর,জলসার আসর বসত। উত্তর কলকাতার বেশ কিছু বনেদি বাড়িতে খুব ধুমধাম করে নববর্ষ পালন করা হত। এখন বাবুয়ানির সেই জৌলুস হয়ত এখন আর নেই ঠিক কথা,পরিবারের অনেকেই প্রয়াত, যারা আছেন তাঁদের একটা বড়ো অংশ , বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের একাংশ বিদেশে, বা দেশের মধ্যেই অন্যত্র, কিন্তু তা সত্বেও যারা কাছাকাছি থাকেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারে নববর্ষ উৎসব যে পালন করা হয় তাতে মোটেই কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির নববর্ষ পালন নিয়েও নানান কাহিনি রয়েছে। প্রথমে এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ রয়েছে সেখানেই রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাসস্থান ছিল। তখন সেই জায়গাটির নাম ছিল গোবিন্দপুর। পরে ইংরেজরা যখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরি করল তখন তারা রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে সুতা-নুটি অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের বিনিময়ে ওই জায়গাটি অধিগ্রহণ করে। তার পরেই রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার অঞ্চলে, অর্থাৎ সুতানুটিতে শোভাবাজার রাজবাড়ি স্থাপন করেন।

তখন রাজবাড়ির একতলার রান্নাঘরে বড়ো বড়ো গর্ত করে দশ বারোটা ইটের উনুন বানানো ছিল। পরে সে ব্যবস্থার আরো বদল হয়। রান্নার জন্য ব্যবহৃত সব সামগ্রী ছিল পেতলের। পেতলের থালা বাটিতেই রাজ পরিবারের সদস্য এবং অভ্যাগতদের খাবার পরিবেশন করা হত। শুধুমাত্র উৎসবের সময়ই রুপোর থালাবাসন বেরোত। তখন সেই বাসনেই খাবার পরিবেশন করা হত। সারাদিন ধরে গানের জলসা এবং ভুরিভোজ চলত। এখন অবশ্য নতুন বছরের প্রথম দিনে সেই জলসা আর হয় না। তবে এখনো নববর্ষের দিন সকালবেলা পরিবারের সদস্যরা স্নান করে পরিবারের কুল দেবতা গোপীনাথ জিউ ও নারায়ণ শিলাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার পর শুরু হয় মিষ্টি মুখ। নানা রকমের মিষ্টি থাকলেও পূর্ণচন্দ্রপুলি এদিনের মেনুতে অবশ্যই থাকে। পরিবারের সকল সদস্যরা একসঙ্গে মিলে সেদিন নববর্ষ উৎসব পালন করেন। সকালের জলখাবারে থাকে লুচি ছোলার ডাল আলুর দম ও দরবেশ গোলাপ জামুন সন্দেশ সহ নানা রকমের খাবার-দাবার। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে থাকে সরু বাসমতি চালের ভাত, সুক্তো,ডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, রুই কাতলা ভেটকি মাছের নানা পদ। এছাড়াও তোপসে মাছের ফ্রাই, আলু বখরার চাটনি, কলার বড়া দিয়ে পায়েস, পাপড় ভাজা ও নানা রকমের মিষ্টি।

বিকেলে পরিবারের সদস্যরা সবাই একসাথে আড্ডায় মেতে ওঠেন। হাসি গল্পে গানে ভরে ওঠে শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুরদালান প্রাঙ্গণ। বিকেলের মেনুতে থাকে আলুভাজা চিলি ভাজা সহ নানা রকমের মুখরোচক স্ন্যাকস্। সঙ্গে চা -কফি। হাসি গল্প গান আড্ডার মধ্যে দিয়ে কেটে যায় অনেকটা সময়। রাতের খাওয়া দাওয়াতেও থাকে এলাহী আয়োজন। পোলাও, লুচি, চিংড়ির মালাইকারি, ফিস ফ্রাই,পাঁঠার মাংস,চাটনি,পাপড় ও নানা রকমের মিষ্টি। জৌলুস কিছুটা ফিকে হলেও অনাবিল আনন্দে কোথাও কোনো খামতি থাকে না। কুল দেবতা গোপীনাথ জিউ-এর আশীর্বাদ নিয়ে যে যার ঘরে ফেরা।

লেখা ২

পয়লা বৈশাখ : কাল ও আজ

সিদ্ধার্থ সেন

পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। এই দিনটিকে ঘিরে বাঙালির মনে প্রচুর আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। তেমনই এক আনন্দঘন মুহূর্তের কথা আজ লিখতে বসেছি।

আমাদের পরিবার উত্তর কলকাতার এক বনেদি যৌথ পরিবার, বাগবাজারের সেন পরিবার, যার সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসের একটা যোগাযোগ রয়ে গেছে। এই পরিবারের প্রাণপুরুষ ভবনাথ সেন নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ধাপা অঞ্চলে প্রাকৃতিক উপায়ে যে বিরাট এক কর্মযজ্ঞের সূচনা করে গেছেন তা আজও প্রভূত অত্যাচারেও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা তুলে রয়েছে। সেটা পূর্ব কলকাতার জলাভূমির সংস্কার, যা বর্তমানে ‘রামসর সাইট’ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই সূত্র ধরে বলা চলে যে আমাদের সেন পরিবার বংশ পরম্পরায় তিন পুরুষ ধরে ধাপার ইজারাদার হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।

চলে আসি আমাদের ছেলেবেলায় সারা বছর আমরা কীভাবে কাটাতাম। যেমন ধরা যাক পয়লা বৈশাখ বা নববর্ষের দিনটির কথা। পয়লা বৈশাখে আমাদের পরিবারের রীতি ছিল চৈত্র মাসের শেষের দুটো দিন বাড়িতে ভিয়েন বসিয়ে অর্থাৎ তথাকথিত মিঠাই তৈরিতে পটু ভিন্ রাজ্যের মিঠাই তৈরির লোক এনে লাড্ডু তৈরি করে পয়লা বৈশাখ ধাপায় গিয়ে হালখাতা উপলক্ষ্যে প্রজাদের মধ্যে বিলি করা এবং তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত উপভোগ করা।

বাড়ির পেছনের মাঠে চালা বেঁধে সেই লাড্ডু তৈরি করে আমাদের ঠাকুরদালানে রাখা হত। এই ঠাকুর ঘরে যেমন ১৯০০ সাল থেকে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মায়ের আরাধনা চলে আসছে তেমনি এই ঠাকুর ঘরেই পয়লা বৈশাখ সকাল থেকে আমরা ভাইয়েরা বাবা-কাকাদের সঙ্গে লাড্ডু প্যাকেটজাত করার কাজে লেগে পড়তাম। সারা ঘর জুড়ে লাড্ডু সাজানো থাকত এবং আমরা তার চারদিকে বসে বালির কাগজের ঠোঙায় ৪টি করে লাড্ডু ভরতাম ও একগন্ডা করে (চারটে) প্যাকেট গুনতি করে ১৫০টা প্যাকেট এক-একটা পেতলের গামলায় রাখা হত। প্রায় দেড়-দুহাজার প্যাকেট এভাবে তৈরি হত। বড়োদের কড়া নজর থাকত যাতে লাড্ডু প্যাকেটে ভরার সময় ভেঙে না যায়। ভেঙে গেলেই সেগুলো নিজেদের জিম্মায় আলাদা ঠোঙাতে রেখে দেওয়া হত। পরে সমস্ত লাড্ডু প্যাকেটজাত হবার পর সেই ভাঙা লাড্ডু,যারা কাজ করত, তাদের মধ্যে ভাগ হত আর আমরা সেই ভাঙা লাড্ডু নিয়ে মহানন্দে ঘরে ফিরে আসতাম। লাড্ডু খাবার লোভে মাঝে মধ্যে আমরা বড়োদের নজর এড়িয়ে কিছু লাড্ডু ভেঙেও ফেলতাম ও আলাদা প্যাকেটে রেখে দিতাম। যদিও লাড্ডুগুলো বেশ শক্ত করে বানানো হত । তাই ভাঙা লাড্ডুর সংখ্যা বেশি হত না। কিন্তু আমাদের লোভের বশে প্রায়ই লাড্ডুদের এভাবে মৃত্যু বরণ করতে হত। পরের দিন বাবা-কাকারা সেই লাড্ডুগুলো গাড়িতে করে ধাপায় নিয়ে গিয়ে হালখাতার অনুষ্ঠানে প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন। আমরাও ছেলেবেলায় ধাপায় গিয়ে প্রজাদের মধ্যে লাড্ডু বিলি করেছি। সে এক মহানন্দের স্মৃতি। ধাপার কাছারি বাড়িতে এই বিলিবন্টনের কাজ হত।

মোটামুটি পয়লা বৈশাখে এটিই ছিল আমাদের ছেলেবেলার আনন্দানুষ্ঠান। তবে বৈশাখ মাসকে মনে রেখে ঐ মাসেই আমরা ভাই-বোন মিলে বাড়িতে প্রতি বছর নানাধরনের অনুষ্ঠান করতাম, যার মধ্যে প্রধানত ঋতুরঙ্গ, নৃত্যগীতিই প্রাধান্য পেত। সে সব অনুষ্ঠান হত আমাদের বাড়ির উঠানে যেখানে আমরা নানাভাবে জড়িত থাকতাম। পয়লা বৈশাখ মূলত ঐ লাড্ডু বিতরণের মাধ্যমেই আমাদের পরিবারে আমরা ছেলেবেলাটা উপভোগ করেছি। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে সেই লাড্ডু বিতরণে ভাঁটা পড়ে । কারণ তৎকালীন সরকারের শাসনকালে ধাপার ইজারা আমাদের চলে যায়। অর্থাৎ সেই থেকে আর লাড্ডু বিতরণের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ আমরা

তখন থেকে আমাদের ইজারাদারির আইনত সত্বা হারাই। এখন যখন আমরা বড়ো হয়ে আস্তে আস্তে সংসারে জড়িয়ে পড়ি তখন পয়লা বৈশাখ আমরা নিজেদের মত করে পালন করি। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বিভিন্ন প্রজন্মে বৈশাখ মাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সেই রীতি আমাদের বাড়িতে আজও চলে আসছে। এখন পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমতে কমতে ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে। আগের মতো সেই এক গ্রাম মানুষ আর বাড়িতে দেখা যায় না, যার মূলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। তাই আগের দিনের সেইসব অনুষ্ঠান ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে।

এখন পয়লা বৈশাখ বাঙালির ঘরে ঘরে পালন করা হয় মূলত বিভিন্ন দোকানে দোকানে হালখাতার বিনিময়ে মিষ্টিমুখের মধ্যে দিয়ে। সেই রীতি আজও অব্যাহত। আমরা আজ বৃদ্ধ হলেও মাঝে মধ্যে এই দিন দোকানে যাই, বিশেষত যেখান থেকে আমন্ত্রণ পাই। সেখানে গিয়ে কিছু অর্থ জমা রেখে সৌজন্য বিনিময় করে একটা মিষ্টির প্যাকট নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। সেই সূত্র ধরে জামা-কাপড় কেনার, গহনা কেনার, হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়ার ধূম পড়তে দেখা যায়, যা অর্থনীতিকে সাময়ীকভাবে চাঙ্গা করে বৈকি। সেইদিক থেকে বললে বাঙালির কাছে পয়লা বৈশাখের অপরিসীম গুরুত্ব আছে, যা আজও অব্যাহত। তবুও পারিবারিক বিভাজনের মাধ্যমে আজকের দিনে এসে মনে হয় পয়লা বৈশাখের সেই উন্মাদনা ক্রমশ যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। যদিও ব্যবসায়ী মহলে হালখাতার মাধ্যমে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব আজও বজায় রাখার একটা প্রচেষ্টা নজর এড়িয়ে যায় না। পয়লা বৈশাখকে ঘিরে হালখাতার অনুষ্ঠানই এখন বাঙালির নতুন বছরের আনন্দের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখা ৩

পয়লা বৈশাখ

অনিমেষ দাশ

পয়লা বৈশাখ বললে সারা দেশে কোথাও হোক না হোক বাঙালির জীবনে এক সময় দেখেছি অন্য একটা আলো জ্বলে উঠত। কিন্তু সে তো উঠত। পাস্ট টেন্স। অতীত কাল। এখনো কি ওঠে ? এই লেখায় এটাই বলতে পারেন আমাদের বিষয়। যে, বাঙালি কি এখনো তার পুরনো ধাঁচ ধরনকে বজায় রেখে বাঙালি হয়ে রয়েছে ? নাকি এই একুশ শতকে এসে আরো অন্য অনেক কিছুর মতো আচারে বিচারে মেশানো এই বাঙালিত্ব ব্যাপারটাকেও সে আদতে বিসর্জন দিয়েছে ? মোদ্দা কথা কবি যতই দুঃখ করুন যে, রেখেছ বাঙালি করে ইত্যাদি, সে কি আর বাঙালি আছে ? থাকলেও কতটা ?

প্রশ্ন তো অবশ্যই, কিন্তু তার আগে বলুন দেখি বাঙালি বাঙালি এই যে এত হইচই করা হচ্ছে, এই বাঙালি কে বা কারা। জলদি জবাব এল ধরুন, কেন মশাই, এই বাংলা দেশে (ওপার বাংলার কথা কিন্তু কেবল হচ্ছে না), মানে পশ্চিমবঙ্গে আর কী, যারা থাকে তারাই হল গিয়ে বাঙালি। বললেই আপত্তি উঠবে , কারণ বোস্টন থেকে ম্যানহাটান, ডালাস থেকে সিঙ্গাপুর --- বাঙালি এখন কোথায় নেই বলতে পারেন ! এটাই যদি ঘটনা হয় তাহলে এই বিদেশের বাঙালিরা কী দোষ করল শুনি ! তারা কি বাঙালি নয় ? তার ওপর আছেন যাঁরা বাংলা বলেন। মানে কিনা যাকে বলে ভাষাগত যোগসূত্র , কিন্তু সেখানেও মেলা বিভ্রাট। আমার এক বন্ধু এই তো হাসতে হাসতে সেদিনই বলছিলেন অটোয় বাড়ি ফেরার , বা বাসে যাতায়াত

করার সময় আলাপ হওয়া বড়োসড়ো একদল বাঙালির কথা, নিয়মিত যাঁরা বলেন যে তাঁরা হলেন হিন্দি স্পিকিং বেঙ্গলিজ। চোখ কান খুলে রাখুন, দেখতে পাবেন কলকাতাতেই এঁদের ঘোরাফেরা সব থেকে বেশি। আবার যদি বলেন বাংলার বায়ুতে একবার যারা শ্বাস নিয়েছে তারাই বাঙালি, তাহলেও সমস্যা কম নয়। বাংলা সেই কবে থেকে তেঁতুল পাতায় নজন তত্ত্বে বিশ্বাস রেখে এসেছে, এবং আজও রাখে। অতয়েব শ্বাসের থিওরিও চলবে না। তাহলে ?

আসলে হয়েছে কী, গত একটা শতাব্দীর মধ্যে বাঙালির জীবন এক কথায় বললে যাকে তছনছ হয়ে যাওয়া বলে তা-ই গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছে যেমন তেমনই আবার শতক পুরোবার আগেই সেই বাঙালিই বঙ্গভঙ্গ না হওয়া অব্দি লড়ে গিয়েছে। বিহার ওড়িশা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। বাংলা ছোটো হয়েছে মাপে। এটা গেল বাইরের দিক। সেই সঙ্গে মুম্বাই চলচ্চিত্রের ধাক্কায়, পাশ্চাত্যের অনুকরণে, প্রাক এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মরিয়া তাল রাখতে গিয়ে তার ভাবনা-চিন্তায় আমূল না হলেও খানিকটা তো বদল অবশ্যই ঘটে গিয়েছে। আজকের বাঙালি নতুন সহস্রাব্দের বেগবান, কেরিয়ার সচেতন, অনেকটাই অতীত ভুলতে চাওয়া অথচ একই সঙ্গে ঐতিহ্য কাতর এক গোষ্ঠি --- দু দিকে তাল রাখতে গিয়ে যারা আজ নাজেহাল।

নাজেহাল কেমন একটু বলি। যেমন ধরুন আমাদের অর্থনৈতিক মূল্যবোধটাই গেছে বদলে। কীরকম ? দেখুন, এই তো সেদিন পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি গাড়ি কেনাকে মনে করতেন হাতি পোষার সামিল। আর আজ এমন দিন খুব দূরে নয় যখন পঞ্চাশ হাজার, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এক লাখ টাকা মাস মাইনেকেও আমরা বলব মধ্যবিত্ত। শিক্ষক, করণিক, অধ্যাপক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, এমনকি ছোটোখাটো অফিসের খুদে অফিসাররাও ভাবতে শুরু করেছেন এসি তো বটেই, একটা গাড়ি না কিনলে আর চলছে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক বাঙালির পুরনো মূল্যবোধের দিন গেছে তো বটেই , যাবারই ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় বিকল্প কোনো নতুন মূল্যবোধের দেখা কিন্তু মিলছে না। মিলছে না যে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে রাজ্যে মন্ত্রীসান্ত্রীদের দিকে তাকালে। এঁদের একাংশ চুরির দায়ে আজ পুলিশ হেপাজতে, যারা নন তাঁদের একাংশকেও ইতিমধ্যেই লোকে চোর ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। না, এঁরা অনেকেই হয়ত পরে বেরিয়ে আসবেন সাধু 'প্রমাণিত' হয়ে, যেমন ইতিমধ্যেই অনেকে এসেছেনও , কিন্তু প্রশ্নটা তো অন্যত্র। আজ থেকে দু-এক দশক আগেও তো কই রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা এরকম অবস্থায় এসে দাঁড়াননি। আজ দাঁড়াচ্ছেন। দাঁড়াচ্ছেন

কেবল নয়, দল থেকে তাঁদের জন্যে সালিশিও করা হচ্ছে। আজ থেকে দু-এক দশক আগেও তো কই, তা সে শাসকই হোক বা বিরোধী , নেতানেত্রীরা এইরকমভাবে খোলাখুলি নারীসঙ্গ নিয়ে বেপরোয়া ছিলেন না। আসলে এই সেদিন পর্যন্ত আমরা সাবেকি বাঙালি ভদ্রলোকের মানসিক অভিভাবকত্ব স্বীকার করতাম, যেটা এখন করাটা আদতে ব্যাকডেটেড। বা বলা যাক, ইন-থিং আর নয় মোটেই। এখন, এই বাঙালির সপক্ষে আপনি কী বলবেন ? ভেতরে ভেতরে যতই সে বদলে যাক তার মুখে তো আজও রবীন্দ্রনাথ, রামিকৃষ্ণ জীবনানন্দ, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের জয়জয়কার। আলুপোস্ত, রোববারের দুপুরে মাংসভাত, হারিয়ে যাওয়া রকের আড্ডা, মোহনবাগান,তুলসি তলায় প্রদীপ হাতে সন্ধ্যে দেওয়া গৃহবধূ বা লিটল ম্যগাজিন --- যে কোনো একটা নিয়ে বলুন, সে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে কাটিয়ে যেতে পারে।পারবেও।কিন্তু এর কোনোটাই বোধহয় আর তার নিজস্বতা প্রকাশের অবলম্বন নয়। অথচ ছিল তো এক কালে। ছিল না ? এখন আর সে অবসরে সুনীল গাঙ্গুলি বা সমরেশ বোস খুলে বসে না। কিন্তু একদিন তো বসত। এবং সেই দিন খুব যে দূরে তা তো আর নয়, যেদিন/ যখন যামিনী রায় বা রামকিঙ্কর তাকে টানত শিকড় ধরে। সোমনাথ হোড় বা শম্ভু মিত্র বললে, অজিতেশ বা নান্দীকার বললে কোথায় যেন শিকড়ে টান অনুভব করত সে।গোপাল ঘোষ বা মীরা মুখার্জি বললে আর যাই হোক অন্তত অবাক চোখে তাকাতে হত না তাকে। কিন্তু দুঃখের কথা, আজকে হয়। কেন হয় ? হয়, কারণ এঁদের দেখে-পড়ে-শুনে যাঁরা একদিন বড়ো হচ্ছিলেন তাঁদের পায়ের তলায় মাটি , নাঃ, আজকে আর নেই। কেন নেই ? এই সেদিন যাঁরা গেল গেল রব তুলেছিলেন বাঙালি ছেলেপুলেকে মাতৃভাষায় দড় করে তুলবার জন্যে মাতৃভাষাতেই তাদের শিক্ষা শুরু করানোর কথা ওঠার সঙ্গেসঙ্গে, তাঁরাই তো তখন জয়যুক্ত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।এখন তো বাচ্চাদের শিক্ষা শুরুর আগেই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মিনি কম্পিউটার , মানে কিনা মোবাইল। গুগল দাদুর আসরে জন্মে থেকেই তো তাদের আসন পাকা করা থাকে। তাহলে ?

আসলে অসুখটা আরো অনেক গভীরে। সর্বভারতীয় স্তরে যেখানে আগে বাঙালি তুড়ি দিয়ে রাজ করেছে, যেমন ধরুন শিক্ষা [ডি পি মুখার্জি মানে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি, অম্লান দত্ত, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, গিরীন্দ্রশেখর বসু (সেই যাঁর সঙ্গে চিঠিচাপাটি চলত খোদ ফ্রয়েড সায়েবের) প্রমুখকে স্মরণে রেখে বলছি] , সেইখান থেকে আজ তার অপসারণ ঘটেছে। আগে বাংলার বাইরে গেলেই সর্বত্র চোখে পড়ত বাঙালিটোলা।আইন ব্যবসা থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রেই সেখানে তাদের একটা গুরুত্ব ছিল। স্বাধীন ভারতে এই গুরুত্বটা তার আগে গিয়েছে।বদলে অন্য প্রদেশের মানুষদের, বাইরে তো

বটেই, এই বাংলাতেও রমরমা। বাঙালি কোণঠাসা হতে হতে আজ এসে হয় ঠাঁই নিয়েছে নিজের রাজ্যে। তার নিজের সাম্রাজ্যেই আজ অন্যের রমরমা। বাংলার ব্যবসার রাশ আজ বাঙালির হাতে নেই। বিষয়টা স্পষ্ট হবে কেবল কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে সেন্ট্রাল অ্যাভেনুর দুপাশে বাড়ির মালিকানা লক্ষ্য করলেই। এই সেদিনও এই অঞ্চলে যেসব বাড়ির মালিক ছিলেন বাঙালি, আজ সেই বাড়িগুলিই চলে গেছে অন্য রাজ্যবাসীর দখলে। বাঙালি আজ নিজের বাসগৃহের মালিকানা হারিয়ে নিকট মফস্বলে (কিছুটা সলটলেক, বাকিটা হটতে হটতে এদিকে ডানলপ, বেলঘরিয়া, দক্ষিণেশ্বর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা আর ওদিকে গড়িয়া, নিউ গড়িয়া ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে) হটে যেতে বসেছে। তার মুখেও আজ তাই অন্যভাষীর তকমা। সে আজ নিজেকে হয় চোখ ঠেরে 'হিন্দিস্পিকিং বেঙ্গলি' জ প্রমাণ করে তথাকথিত উন্নয়নের প্রসাদ লাভ করতে ব্যস্ত, নয়ত মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় হবে না অন্য ভাষায় তাই নিয়ে তুলকালাম চালাতে উদগ্রীব। স্বভাবতই তার পক্ষে আর নিজের ভূমির রাশ নিজের হাতে রাখার স্বপ্ন না দেখাই মঙ্গলজনক।

ফলে পয়লা বৈশাখ অবশ্যই ঠিক আছে। নববর্ষের আনন্দ অনুষ্ঠানও ঠিক আছে। কিন্তু তার বেশি কিছু ? বাঙালি যদি আজও তার ঘর গুছোতে বদ্ধ পরিকর না হয়, কে জানে আর কতদিন সম্ভব !

লেখা ৪

বঙ্গাব্দ : একটি আলোচনা

অর্ঘমা

ভারতবর্ষে বর্ষগণনার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। আমাদের দেশে সময়, স্থান এবং ব্যক্তির নামভিত্তিক বহু ধরনের বর্ষ গণনা দেখা যায়। প্রথমে দেখা যাক প্রধানত কী কী নামে বর্ষ গণনা প্রচলিত ছিল বা আছে :

(১) কল্যব্দ : প্রাচীনতম কাল গণনার যে পদ্ধতি এই দেশে অনুসৃত হয় তা কল্যব্দ। সম্ভবত কল্যব্দ বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম কাল বা বর্ষ গণনার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের দ্বারা প্রস্তুত। এটি সম্পূর্ণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত এবং এই পদ্ধতির কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নেই। ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৭/১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে উজ্জয়িনীর মধ্যরেখার ভিত্তিতে এই অব্দের শুরু। আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এবং ১ বৈশাখ ৫১২৪ কল্যব্দ হবে। এটি নিরয়ণ সৌর বর্ষ ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি।

(২) শকাব্দ : শকাব্দ (অথবা শালিবাহনাব্দ) হল ভারতীয় উপমহাদেশে বহুলপ্রচলিত এক প্রাচীন সৌর অব্দ। এই অব্দ বঙ্গাব্দের ৫১৫ বছর পূর্বে এবং খ্রিস্টাব্দের ৭৮ বছর পরে প্রচলিত হয়। শকাব্দের উৎস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি শালিবাহনের প্রয়াণ দিবস থেকেই শকাব্দের সূচনা। রাজা শালীবাহনের রাজত্বকালে একবার বহিরাগত শক জাতি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। তখন শালিবাহন শকদের পরাজিত করেন এবং 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন। সেখান থেকেই এই অব্দের নাম হয় শকাব্দ। শকাব্দ একটি সৌর অব্দ।

কল্যব্দ, শকাব্দ এবং খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে, সম্পর্কটি এইরকম :
কল্যব্দ – ৩১৭৯ = শকাব্দ।
শকাব্দ + ৭৮ = খ্রিস্টাব্দ।

কল্যব্দ – ৩১০১ = খ্রিস্টাব্দ।

(৩) গুপ্ত সংবৎ : সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে গুপ্তাব্দ গণনা শুরু। ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩২১ খ্রিস্টাব্দ ছিল প্রথম গুপ্তাব্দ। এটি একটি চান্দ্র-সৌর বর্ষপঞ্জি।

(৪) যুধিষ্ঠিরাব্দ : যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর এই অব্দ চালু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই অব্দের সপক্ষে তেমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

(৫) বিক্রম সংবৎ : বিক্রম সংবৎ গুজরাটে এবং উত্তর ভারতে প্রচলিত। ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বিক্রামাব্দ শুরু। এটি নিরয়ণ সৌরবর্ষ-ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি।

(৬) বঙ্গাব্দ : আজকের মূল আলোচ্য বিষয় বঙ্গাব্দ। নিচে বঙ্গাব্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বঙ্গাব্দ : বাংলাদেশ এবং পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে এই বর্ষপঞ্জি ব্যবহৃত হয়। বঙ্গাব্দ শুরু হয় পয়লা বৈশাখ বা বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে। বঙ্গাব্দ সব সময়ই গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জির চেয়ে ৫৯৩/৫৯৪ বছর কম। বঙ্গাব্দের সূচনা সম্পর্কে দুটি মত চালু আছে।

প্রথম মত অনুযায়ী : প্রাচীন বঙ্গদেশের (গৌড়) রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন। আধুনিক বঙ্গ, বিহার এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রচলিত অনুমান অনুযায়ী জুলীয় বর্ষপঞ্জির বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ৫৯৪ এবং গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জির শনিবার ২০ মার্চ ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে সম্ভাব্য বঙ্গাব্দ বর্ষপঞ্জির শুরু ২৩ মার্চ ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

দ্বিতীয় মত অনুসারে :
ইসলামি শাসনামলে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হত। মূল হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বছর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিন। একারণে চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। আর বঙ্গদেশে চাষাবাদ ও এজাতীয় অনেক কাজ ঋতু নির্ভর। এজন্য মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত হিজরি চান্দ্র

পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ শিরাজিকে হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ফতুল্লাহ শিরাজির সুপারিশে পারস্যে প্রচলিত ফার্সি বর্ষপঞ্জির অনুকরণে ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। তবে তিনি ঊনত্রিশ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসন আরোহণের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহরম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

এই যুক্তিটি অসার। কারণ হিজরি এবং বঙ্গাব্দ দুটি ভিন্ন প্রকারের ক্যালেন্ডার এবং তাদের উৎপত্তি সময়ও আলাদা। হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জির দৈর্ঘ্য ৩৫৪.৩৬৬৫৯ সৌরদিন এবং সৌর বঙ্গাব্দের দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৫৬৩৬৩ সৌরদিন।

এখন দেখা যাচ্ছে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে ইসলামিক হিজরি এবং শশাঙ্ক প্রবর্তিত বঙ্গাব্দ নিয়ে। এখন যা বঙ্গাব্দ বলে প্রচলিত তার প্রকৃত পূর্বসূরি তাহলে কে ? ইসলামিক ক্যালেন্ডার হিজরি শুরু হয় ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান বঙ্গাব্দ ১৪২৯। হিজরি শুরুর বছরকেই যদি বঙ্গাব্দের ভিত্তিবর্ষ ধরা যায় সেক্ষেত্রে বর্তমান খ্রিস্টাব্দের সংখ্যা হওয়া উচিৎ (১৪২৯ + ৬২২) খ্রিস্টাব্দ বা ২০৫১ খ্রিস্টাব্দ যা দৃশ্যতই অসম্ভব। অপর দিকে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দকে বঙ্গাব্দের ভিত্তিবর্ষ স্বীকার করলে কোনো অসংগতি থাকে না।

আবার অনেক ঐতিহাসিক বলেন বাংলা বর্ষপঞ্জি এসেছে ৭ম শতকের হিন্দু রাজা শশাঙ্কের কাছ থেকেই। আকবরের সময়ের অনেক শতক আগে নির্মিত দুটি শিব মন্দিরে বঙ্গাব্দ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এটাই নির্দেশ করে, আকবরের সময়ের আরও অনেক আগেই বাংলা বর্ষপঞ্জির অস্তিত্ব ছিল।

বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য কোন সময়ে কী কাজ হবে এধরনের ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদিক যুগের জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শীরা তখন মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের চলাফেরা দেখে সময় সম্পর্কিত হিসাব নিকাশ ও এই সব আচার অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করার কাজ করতেন। জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক পাঠ ছিল ছয়টি প্রাচীন বেদাঙ্গ বা বেদ সংক্রান্ত ছয়টি প্রাচীন বিজ্ঞানের একটি অংশ। বৈদিক আচার

অনুষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি একটি উন্নত ও পরিশীলিত সময় নির্ণয় কৌশল এবং বর্ষপঞ্জি প্রস্তুত করেন।

বিক্রমসংবতের নামকরণ করা হয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নাম অনুসারে, এটা শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দ থেকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে সেই বর্ষপঞ্জির সূচনা হলেও বাংলা বর্ষপঞ্জি শুরু হয়েছিল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় বঙ্গাব্দ শুরু হয়েছিল মহারাজা শশাঙ্কর সময়ে। সম্রাট আকবর হিজরি ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বঙ্গাব্দের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন খাজনা আদায়ের স্বার্থে।

শামসুজ্জামান খানের মতে, 'একে বাংলা সন বা সাল বলা হয়। এই সন ও সাল হল যথাক্রমে আরবি ও ফারসি শব্দ।' মুসলিম শাসন কালে বাংলায় ফারসি এবং আরবি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ফলে বঙ্গাব্দ শব্দটি সন এবং সালের সঙ্গে একই ভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়।

কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে সোমবার ২২ মার্চ ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাত্রি ১০: ৪৪ IST সময়ে সূর্যের নিরয়ণ মেষ রাশিতে সংক্রমণ হয়েছিল (নিচে দেওয়া ছবি দ্রষ্টব্য)। ফলে সম্ভবত মঙ্গলবার ২৩ মার্চ ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে পয়লা বৈশাখ দিনটি পালন করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

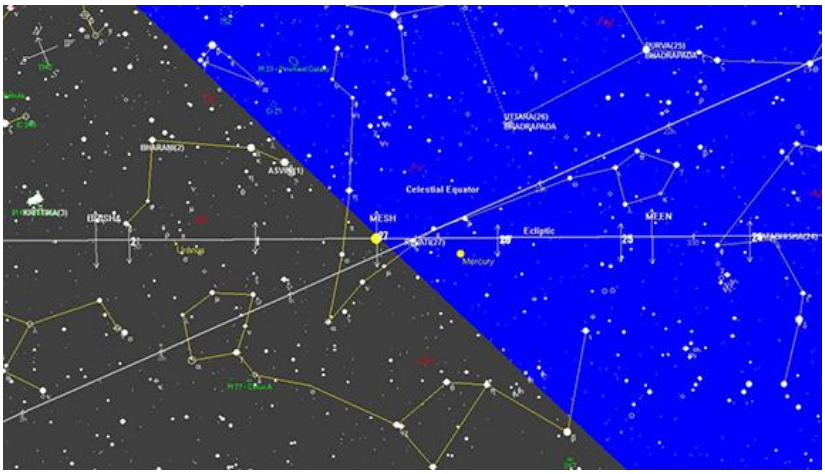

ছবিতে : বঙ্গাব্দ শুরু হয় ২৩ মার্চ ৫৯৪ এডি। মাঝের হলুদ বৃত্তটি সূর্য। সূর্য মেষ রাশিতে সংক্রমণ করায় বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে কী কী পাওয়া গেল দেখা যাক :

(ক) ভারতবর্ষে অনেক ধরনের বর্ষপঞ্জি প্রচলিত।

(খ) বর্ষপঞ্জি লুনি-সোলার অর্থাৎ চান্দ্র-সৌর এবং সৌর মাস-ভিত্তিক।

(গ) প্রায় সব বর্ষপঞ্জি কোনো ব্যক্তির নামাঙ্কিত।

(ঘ) কল্যব্দ এবং বঙ্গাব্দ ব্যক্তির নাম বর্জিত।
(ঙ) লুনি-সোলার বর্ষপঞ্জি সাধারণত কোনো ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।
(চ) কল্যব্দ প্রাচীনতম ভারতীয় বর্ষপঞ্জি। এই বর্ষপঞ্জি ধর্মীয় এবং ব্যক্তি প্রভাব মুক্ত।
(ছ) বঙ্গাব্দ এই কল্যব্দের দিনক্ষণ এবং গণনা অনুসরণ করে নির্মিত।
(জ) গ্রেগরিয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে মঙ্গলবার ২৩ মার্চ ৫৯৪ বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল বলে মনে হয়।
(ঝ) ইসলামিক বর্ষপঞ্জি হিজরি ক্যালেন্ডার শুরু হয় ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ।
(ঞ) ওপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় বঙ্গাব্দের ভিত্তি হিজরি বর্ষপঞ্জি নয়।
(ট) বঙ্গাব্দ কল্যব্দের ধারা এবং গণনা অনুসারে নির্মিত। বঙ্গাব্দ ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত।
(ঠ) হিজরি বর্ষপঞ্জি চান্দ্রমাস ভিত্তিক। বঙ্গাব্দ সৌরমাস ভিত্তিক। আকবর চেষ্টা করেছিলেন এই দুই বর্ষপঞ্জির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা থেকে খাজনা আদায়। হিজরি ঋতু-ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি নয়। বঙ্গাব্দ প্রায় ঋতু-ভিত্তিক। বর্ষার শেষে ফসল উঠলে খাজনা পেতে সুবিধে হবে। সেই কারণেই এই প্রচেষ্টা।
(ড) কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক চলছে বঙ্গাব্দ এবং হিজরি বর্ষপঞ্জি নিয়ে। ঐতিহাসিক ভাবে দুটি বর্ষপঞ্জি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত এবং দুটির ধরনও আলাদা। বঙ্গাব্দ সৌরবর্ষের ক্যালেন্ডার এবং হিজরি চান্দ্রবর্ষের ক্যালেন্ডার। এই দুধরনের ক্যালেন্ডারের সমন্বয় একটি লুনি-সোলার ক্যালেন্ডারের মাধ্যমেই করা সম্ভব। বাংলায় সে ধরনের কোনো ক্যালেন্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্রাট আকবর যদি তেমন কোনো চেষ্টাও করে থাকেন তবে তা তাঁর পরবর্তী সময়ে বিশেষ কাজে আসেনি এবং তেমন কোনো প্রচেষ্টা হয়ে থাকলেও তা অসফল এবং আজ তা পরিত্যক্ত।

কেউ কেউ আবার বলছেন ‘বঙ্গাব্দ এবং পয়লা বৈশাখ হিন্দু সংস্কৃতি’ – এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সুতরাং উপসংহার টানা যেতে পারে এই বলে যে :
বঙ্গাব্দ এবং হিজরি প্রায় সমসাময়িক এই কারণে কেউ কেউ হিজরি শুরুর সময়ই বঙ্গাব্দের ভিত্তিবর্ষ এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তবে সেটি যে ভ্রান্ত তা

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা বহু বছর মুসলমান শাসকদের হাতে থাকায় বেশ কিছু ইসলামিক প্রথা, ভাষা এবং শব্দ ভারতীয়রা গ্রহণ করেন। সম্ভবত সে কারণেই বঙ্গাব্দ অপেক্ষা সন এবং সাল অধিক প্রচলিত হয়। এইসব কারণেই একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে একটা প্রচার হচ্ছে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দের সংস্কারক। আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রচলিত হয়েছে যে বঙ্গাব্দ হিন্দু বর্ষপঞ্জি। এটিও সর্বৈব ভাবে ভ্রান্ত একটি অপপ্রচার।

বঙ্গাব্দ এবং কল্যব্দ সম্পূর্ণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত বর্ষপঞ্জি।

তথ্যসূত্র :

1. Indian Calendric System By Commodore S.K. Chatterjee.
2. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড
3. Wikipedia
4. Skymap Pro 11 Software

লেখা ৫

পয়লা বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আদিত্য ঠাকুর

বাংলা নববর্ষ আর পয়লা বৈশাখ বিষয়টিতে যাবার আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে কিছু বলে নিলে সুবিধে হবে। যেমন বছরের দৈর্ঘ্য কতটা, কত ধরনের বছর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটামুটি দু'ভাবে বছরের দৈর্ঘ্য মাপা হয়। একটি পদ্ধতি স্থির তারা ভিত্তিক বছর। যাকে বাংলায় বলা হয়ে থাকে নিরয়ণ বর্ষ বা ইংরেজিতে Sidereal year.

অপর পদ্ধতিটি যা চালু আছে সেটি ক্রান্তীয় বর্ষ বা সায়ন বর্ষ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Tropical year. পৃথিবী বাসন্ত বিষুব বিন্দু (Vernal Equinoctial Point) থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করে আবার ঐ বিন্দুতে ফিরে আসার সময়ই হচ্ছে সায়ন বা ক্রান্তীয় বছর। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত। এই পদ্ধতিটি সংস্কার করেছিলেন পোপ গ্রেগরি ত্রয়োদশ। তাঁর নামানুসারে এই সংস্কার করা ক্যালেন্ডারের নামকরণ হয়েছে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। এই পদ্ধতিতে বছরের হিসাব ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

বৈশাখ মাস বা পয়লা বৈশাখের গুরুত্বর কারণ বর্তমানে বৈশাখ মাসে বাংলা সহ বেশ কিছু আঞ্চলিক রাজ্যে বছরের শুরু হয়। এতগুলো মাস থাকতে হঠাৎ বৈশাখ মাসেই কেন বছর শুরু হল কারণটা জানতে হলে আমাদের একটু জ্যোতির্বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে।

মহাকাশে চারখানি Cardinal Points বা অত্যাবশ্যক বিন্দু কল্পনা করা হয়, দুটি হচ্ছে Equinoctial Points বা বিষুব বিন্দু অপর দুটি Solstice Points বা অয়নান্ত বিন্দু।

বছরের দুটো দিনে (বিষুব-দিন বা Equinoctial Day) দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়। এই দুটি দিনে আপেক্ষিক ভাবে সূর্য দুটি মহাবৃত্তের যথাক্রমে মহাবিষুব (Celestial Equator) এবং ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) ছেদ বিন্দুতে অবস্থান করে। দিন দুটি হল মোটামুটি ২০/২১ মার্চ (বাসন্ত দিন) এবং ২২/২৩সেপ্টেম্বর (শারদ দিন)। এই দুটি দিনে সূর্য ঠিক পূর্ব দিকে ওঠে (Due East) এবং পশ্চিমে দিকে অস্ত যায় (Due West)। ২০/২১মার্চ দিনটিকে পাশ্চাত্য মতে বসন্ত ঋতুর শুরু বলে ধরা হয়। ভারতীয় মতে তখন চৈত্র মাস। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ২০/২১ মার্চ দিনটি অপরিবর্তিত ভাবে বসন্ত ঋতুর শুরুর দিন থাকলেও ভারতীয় ক্যালেন্ডারের হিসেবে বসন্ত ঋতুর বা অন্য যে কোনো ঋতুর নির্দিষ্ট শুরুর দিন বলে কিছু হয় না। আমাদের দেশীয় ক্যালেন্ডারের হিসেব ঋতু শুরুর এই দিনগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিবর্তিত হয়। কেন এই দিনটি পরিবর্তিত হতে থাকে এর পেছনে একটি বিশেষ মহাজাগতিক ঘটনা আছে। আকাশে দুটি মহাবৃত্ত যথাক্রমে মহাবিষুব (Celestial Equator) এবং ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) কল্পনা করা হয় যার পরস্পর পরস্পরকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে। এই দুটি বিন্দুই বিষুববিন্দু বা Equinoctial points or Equinoxes । মহাবিষুব বৃত্ত ক্রান্তি বৃত্তর ওপর নির্দিষ্ট নিয়মে প্রায় ২৫৮০০ বছরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পূর্ণ এক পাক বা ৩৬০° ডিগ্রি ঘুরে আসে। এই ঘুর্ণনকে বলা হয় অয়নচলন বা Precession of Equinox। মহাবিষুব বৃত্তের এই চলন ক্রান্তিবৃত্তের ওপর পূর্ব থেকেপশ্চিম দিকে হয়। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এই গতিকে হিসেবের মধ্যে ধরে বছরের এক নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেছে । ফলে এই ক্যালেন্ডারে ঋতু একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আসে। কিন্তু ভারতীয় ক্যালেন্ডার স্থির নক্ষত্র-ভিত্তিক। এখানে বছরের মাপ সামান্য বেশি। ফলে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে আজকের পয়লা বৈশাখ আর 100 বছর আগের পয়লা বৈশাখ একই তারিখে হবে না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ মে জন্মেছিলেন আর আমরা সবাই জানি সেই দিনটি ছিল ২৫ বৈশাখ। আজকের দিনে ২৫ বৈশাখ সাধারণ ভাবে ৮ অথবা ৯ মে তে সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেড়শ বছরে দুই ক্যালেন্ডারের তফাৎ হয়ে গেছে প্রায় দু'দিন। মোটামুটি ৭২ বছরে অয়নচলনের পরিমাণ ১° পশ্চিম দিকে। মানে ৭২ বছরে মহাবিষুব রেখা ক্রান্তীয় বৃত্তের ওপর ১° পশ্চিম দিকে সরে যায়। আর সূর্য আপেক্ষিক ভাবে মোটামুটি এক দিনে পূর্ব দিকে ১ ডিগ্রি পথ অতিক্রম করে। ফলে ভারতীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে ৭২ বছর আগের পয়লা বৈশাখে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে যে দিন ছিল আজকের পয়লা বৈশাখে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে তার পরবর্তী দিনটিতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যা কিছু গণনা তা মূলত সূর্যসিদ্ধান্ত

গ্রন্থের ভিত্তিতেই করা হত এবং আজকের পঞ্জিকাকাররা এখনও সূর্যসিদ্ধান্ত মতেই পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন।

আগে উল্লেখিত মহাকাশে যে চারখানি Cardinal Points বা অত্যাবশ্যক বিন্দু কল্পনা করা হয়েছে, তার দুটি হচ্ছে Equinoctial Points বা বিষুব বিন্দু অপর দুটি Solstice Points বা অয়নান্ত বিন্দু।

Ecliptic বা ক্রান্তিবৃত্ত বা অয়নবৃত্তের ওপর একটি স্থির নক্ষত্র ভিত্তিক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে প্রচলিত ভারতীয় ক্যালেন্ডারের হিসেবে বছর শুরু ধরা হয়। এই বিন্দুটি রেবতী নক্ষত্রের ১০' (কৌণিক মিনিট) পূর্বে অবস্থিত এবং এই বিন্দুটিকে মেষ রাশির আদি বিন্দু বা মেষাদি বিন্দু বলা হয়।

২৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে বাসন্ত বিষুব-বিন্দু এবং মেষাদি-বিন্দু দুটি সমাপতিত হয়েছিল। তৎকালীন এবং পরবর্তী কালের ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা ঐ বিন্দুতে সূর্যের সংক্রমণের সময়ের বা মেষরাশিতে সংক্রমণের সময়ের পরবর্তী দিনটিতে বছরের শুরু বলে মনে করতেন। অর্থাৎ মেষরাশিতে সূর্যের সংক্রমণ বৈশাখ মাসের শুরু এবং পয়লা বৈশাখ বলে গণ্য করা হত। ২৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে মেষরাশিতে সূর্যের সংক্রমণ হয়েছিল ২১h ৫৩m সময়ে। সেকারণে ২১ মার্চ ২৮৫ খ্রিস্টাব্দে পয়লা বৈশাখ হয়েছিল।

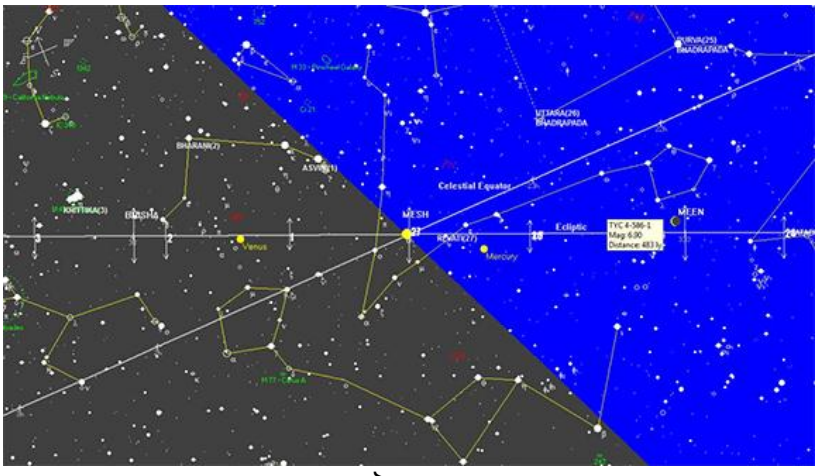

ছবিতে : ২১ মার্চ ২৮৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা বৈশাখের আকাশের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। ছবির মাঝামাঝি সাদা অনুভূমিক রেখাটি ক্রান্তিবৃত্ত বা Ecliptic. এই রেখার মাঝখানের হলুদ বৃত্তটি সূর্য। সূর্য সবে মেষ রাশিতে সংক্রমণ করেছে। সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করে বৈশাখ মাসে।

বলা যায় সেই সময় থেকেই বাংলা ক্যালেন্ডারে পয়লা বৈশাখ বছরের শুরু বলে মনে করা হত। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের বছরকে বলা হয় ক্রান্তীয় বছর বা_সায়ন বছর বা ট্রপিক্যাল ইয়ার এবং বছরের মাপ ৩৬৫.২৪২১৯ দিন। স্থির নক্ষত্র-ভিত্তিক ভারতীয় ক্যালেন্ডারের বছরকে বলা হয় নিরয়ণ বছর বা সাইডেরিয়াল ইয়ার এবং

বছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৫৬৩৬৩ দিন। দেখা যাচ্ছে নিরয়ণ বছর ক্রান্তীয় বছরের তুলনায় কিছুটা বড়ো এবং এর পরিমাণ ২০m ২৪.৫ s. দুটি ভিন্ন ধরনের বছরের দৈর্ঘ্যের এই ফারাকের কারণেই কোনো একটা সময় দু ধরনের বছর একসঙ্গে শুরু হলেও সায়ন বছরের দিন সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং প্রতি ৭২বছরে একদিন বেড়ে যায়। নিরয়ণ বছর ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। কিন্তু ক্রান্তীয় বছর ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে। ফলে আজ থেকে প্রায় তেরো হাজার বছর পরে বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে হেমন্তের হিমেল অনুভূতি মিলবে আর কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে গ্রীষ্মের দহন সহ্য করতে হবে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বৈদিক যুগে বাসন্ত বিন্দু ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রে অর্থাৎ বছর শুরু হত যখন সূর্য অবস্থান করত মৃগশিরা নক্ষত্রে। বৈদিক যুগে নিরয়ণ বছরের প্রচলন ছিল না। সায়ন বছরের হিসাবেই ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্ষ গণনা হত। সুতরাং বরাবর পয়লা বৈশাখে আমাদের নতুন বছর শুরু এমনটি মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি একটি ন্যাশনাল ক্যালেন্ডারের সূচনা করেন যা ট্রপিক্যাল বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। সেই ক্রান্তীয় ক্যালেন্ডারের বছর শুরু ২২ মার্চ যা কিনা পয়লা চৈত্র, আর বছরের প্রথম মাস ধরা হয় চৈত্রকে। এই ন্যাশনাল ক্যালেন্ডারের হিসাবে অবশ্য ঋতু নিয়ম মেনেই আসবে যাবে। তবে ভারতীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক কাজকর্ম এই ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে করা সম্ভব নয়। ফলে পঞ্জিকা নির্মাতারা এই ক্যালেন্ডারকে গ্রহণ করেননি। পরে ১৪ এপ্রিল ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পয়লা বৈশাখ ৫১০৫ কল্যব্দতে (কলিযুগের শুরুর দিন থেকে যে অব্দ গণনা চালু হয়, ৩১০২ বি.সি. ১৭/১৮ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত থেকে) ভারত সরকার অপর একটি সর্বভারতীয় নিরয়ণ সৌর বর্ষপঞ্জী প্রবর্তন করেন। এই পঞ্জিকায় বছর হিসাবে কল্যব্দকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার এই নতুন নিরয়ণ ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করে। ফলে আপাতত কিছুদিন ১৪ বা ১৫এপ্রিল পয়লা বৈশাখকে আমরা পাব।

আর একটি কথা, সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ মতে ২০২৩ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ৫১২৪ কল্যব্দ অর্থাৎ দিনটি ১ বৈশাখ। যদিও বঙ্গাব্দের হিসাবে ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ ১ বৈশাখ। এই ফারাকের কারণ সূর্য কখন নিরয়ণ মেষ রাশিতে প্রবেশ করছে তার ওপর নির্ভর করে মাসের প্রথম দিন ঠিক করা হয়।

কৌতূহলীদের জন্য একটু সংযোজন :

আগে বলেছি প্রায় প্রতি ৭২ বছরে অয়ন চলনের পরিমাণ ১°
(১) ২৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২১ মার্চ পয়লা বৈশাখ ছিল। প্রতি ১° অয়নচলনের জন্য গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে নিরয়ণ ক্যালেন্ডারের দিনের ফারাক হয় ১দিন। দেখা যাক ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে অয়ন কতটা সরে গেছে :
{(২০২৩-২৮৫)÷৭২}°= ২৪.১৪°

প্রতিদিন অর্থে একদিন পিছিয়ে যাওয়া ধরলে এখন পয়লা বৈশাখ ২১ মার্চের আরো প্রায় ২৪ দিন পরে আসবে। অর্থাৎ ১৪/১৫ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ হওয়ার কথা। বাস্তবিক আগামী ১৪৩০ বাংলা সালের পয়লা বৈশাখ ১৫ এপ্রিলে সংঘটিত হবে। সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণের সময় প্রতি বছর ভিন্ন হয়, সে কারণে পয়লা বৈশাখ বর্তমানে কখনো ১৪ এপ্রিল আবার কখনো ১৫ এপ্রিল হয়ে থাকে। এইভাবে আগামী দিনে পয়লা বৈশাখ ইংরেজি মতে কবে হবে মোটামুটি সহজেই বার করা যায়।

(২) মহাকাশে অবস্থিত রাশিচক্রকে ২৭টি নাক্ষত্রিক ভাগে ভাগ করা হয়। এক-একটি ভাগ এক-একটি নক্ষত্র। বর্তমানে বাসন্ত বিন্দু উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অবস্থান করছে। নিরয়ণ মেষ রাশি থেকে বর্তমান বাসন্ত বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব প্রায় ২৪° ১০'৪৩"। ঋগ্বেদের সময়ে বাসন্ত বিন্দু মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থান করত। যা ছিল নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু থেকে ৬০° পূর্বে। সুতরাং এখনকার বাসন্ত বিন্দুর অবস্থান থেকে মৃগশিরা নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব ছিল (২৪° ১০'৪৩"+৬০°) = ৮৪° ১০'৪৩". এখন প্রতি ৭২ বছরে অয়ন পশ্চিম দিকে ১° সরে যায়। সুতরাং ৮৪° ১০'৪৩" (বা ৮৪.১৭৮৬°) সরে আসতে অয়নের সময় লেগেছে ৮৪.১৭৮৬° ×৭২ বছর অর্থাৎ ৬০৬১ বছর। সুতরাং ঋগ্বেদের সময়কাল আজ থেকে প্রায় ৬০৬১ বছর আগে বা ৪০৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালে।

সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন।

লেখা ৬

চাই সমাজের সব স্তরে প্রকৃত সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ওঁরা কাজ করেন প্রধানত পুরুষের অধিকার নিয়ে : কথাটা শুনলে একটু চমকেই ওঠেন সবাই, অন্তত আমাদের চারপাশের মানুষরা তো বটেই। কারণ , আমাদের চলতি সামাজিক অবস্থানে নারীর অধিকার নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই , হরদম যেখানে খুন ধর্ষণ রাহাজানির যেসব খবর চোখে পড়ে সেখানে সবটুকু পড়লে স্পষ্টত একটা কথাই বেরিয়ে আসে যে, এই পরিস্থিতিতে নারীরা সফট টার্গেট ছাড়া কিছুই নন। অর্থাৎ মেয়েরা এই সামাজিক পরিস্থিতির সহজ শিকার। সেখানে আলাদা করে এভাবে পুরুষের অধিকার নিয়ে কাজ করবার জন্য সংগঠন ! একটু অবাক লাগে বইকি !

এই অবাক হওয়া মন নিয়েই হাজির হয়েছিলাম পূর্ব কলকাতায় অল বেঙ্গল মেন' স ফোরাম বা এ বি এম এফ-এর ছিমছাম অফিসে, ফোরামের প্রেসিডেন্ট এম আর এ নন্দিনী ভট্টাচার্যের মুখোমুখি। কী ধরনের কাজ করে এই সংগঠন, প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই জানিয়ে রাখলেন নন্দিনী, তাঁর নামের আগে বসা এম আর এ শব্দ ত্রয়ীর অন্তর্নিহিত অর্থ । বললেন, এম আর এ মানে হল মেন' স রাইট অ্যাক্টিভিস্ট । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য : যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে আমরা কারা,

কী করতে চাইছি, কীভাবে করতে চাইছি ইত্যাদি ; আমরা বলি আমরা পুরুষের সব রকম অধিকার নিয়ে কাজ করি। পুরুষের অধিকার, তিনি বলেন, প্রতিনিয়ত নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়। কারণ, তাঁরা সামাজিকভাবেই নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন নন। এর ফলে তাঁরা কিছু মহিলা এবং সমাজের নানা অংশের মানুষের দ্বারা প্রতারিত হন। 'পুরুষের বিরুদ্ধে যখন কোনো অভিযোগ ওঠে, তা সে ফলস রেপ কেসই হোক বা অন্য কোনো অভিযোগ, তখন তাঁরা চুপ করে থাকেন, তাঁরা ভয় পান আইন অনেকাংশে মেয়েদের পক্ষে বলে যে ব্যাপক প্রচার আছে বলে।

নন্দিনী বলছিলেন কী নারী কী পুরুষ, সুবিধাবাদীরা কীভাবে এই প্রচারের সুবিধাটাকে কাজে লাগান । তাঁর মতে, সুবিধাবাদীদের কাছে নারী পুরুষ, আইন বেআইন কোনোটাই কোনো ব্যাপার নয়। সেক্ষেত্রে , নন্দিনীর মতে, পুরুষদের এইভাবে দেখা দরকার যে, আইন যেমন মেয়েদের পক্ষে আছে তেমনই পুরুষদের অধিকার রক্ষা করার জন্যও আইন নেই তা নয়, যেটা দরকার তা হল পুরুষদের সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা। ওঁর কথা থেকে জানা যাচ্ছিল তাঁরা কীভাবে প্রত্যেক মাসে কিংবা নিদেন পক্ষে ১৫ দিন অন্তর বিভিন্ন এলাকায় সোশ্যাল ও লিগাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের আয়োজন করেন যেখানে আইনজ্ঞ থেকে শুরু করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, পুলিশের রিটায়ার্ড পার্সোনেলরা সবাই থাকেন। কেবল কলকাতা নয়, এইসব ক্যাম্পের ওঁরা আয়োজন করেন কলকাতার বাইরে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া , হুগলি সহ বিভিন্ন জায়গায়। এসব ক্যাম্পে এবিএমএফের সদস্যরা তো বটেই, যোগ দেন বাইরের লোকরাও।

নন্দিনী জানাচ্ছিলেন এবিএমএফ-এর তরফে তোলা উওমেনস কমিশনের মতো মেনস কমিশনের দাবির কথাও, যেখানে বিভিন্ন রকম প্রতারণার শিকার পুরুষরা এবং তাঁদের পরিবারের তরফে তোলা আবে অভিযোগ। শহরে ও গ্রামে এ ধরনের অত্যাচারের সংখ্যা কত! কী বলছে ফোরামের হিসাব? প্রশ্নের জবাবে নন্দিনী জানাচ্ছিলেন তাঁরা পুরুষ বলতে বালক, শিশু, কিশোর, প্রৌঢ় সবাইকে বোঝেন। সবার অধিকার নিয়েই তাঁদের চিন্তা। নন্দিনী বলছিলেন কীভাবে পুরুষ শিশু-কিশোররা বিভিন্ন রকম অ্যাবিউজের শিকার হয়েও সাহায্য পায় না, অথচ শিশু কন্যার উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে আইন ও নানা সংস্থার প্রাথমিক হলেও সাহায্য মেলে।তিনি বলছিলেন, তাঁদের দাবি এ ব্যাপারেও সঠিক কাউন্সেলিং হোক।জানালেন, এরকম সমস্যা ফোরামে এলে তাঁরা যেসব সংস্থা শিশু শ্রমিক বা শিশু কিশোরদের সমস্যা নয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ করিয়ে দেন।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক ফারাক কতটা ? প্রশ্নের জবাবে নন্দিনী বললেন, আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁরা কাজ করেন ডাভিয়া বা ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ অ্যান্ড ভায়োলেন্স নামে ৮৭টি দেশকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার সঙ্গে। তাঁর কথায় , বিদেশে পুরুষদের প্রতি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ঘটনা যেমন কমবেশি আছে কিন্তু তার থেকে বেশি হল পেরেন্টাল অ্যালিয়েনেশন, মানে বাচ্চাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে বা থাকতে না দেওয়া বা তার অধিকার নিয়ে জটিলতার ঘটনা।তিনি বলছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের কথা যেখানে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন পুরুষকে বাড়ি থেকে বিতাড়ণের মতো ঘটনা যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে ডিভোর্সের পর খুব বেশি খোরপোশ চাওয়ার ঘটনাও। এতে সব ক্ষেত্রেই সচেতনতা বাড়ছে। কিন্তু এই শ্রেণি বিভাজিত সমাজ, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষ সর্বদাই ক্ষমতাবান সমষ্টির দ্বারা অত্যাচারিত, পিষ্ট হচ্ছেন, সেখানে একজন অর্থ বা ক্ষমতার কৌলীন্যে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির পক্ষে প্রতারণার কতখানি বিচার পাওয়া সম্ভব --- এ প্রশ্নে তিনি আবারও জোর দেন কমিশনের প্রশ্নে। কমিশন গঠন, সচেতনতার বিস্তার ঘটতে ঘটতেই হয়ত একদিন অত্যাচারিত মানুষগুলি বিচারের দাবিটুকু অন্তত জানাতে পারবেন। তার পরের পর্ব নিঃসন্দেহে অনেক শতাব্দীর মনীষার কাজ। হয়তবা।

লেখা ৭

মনের খবর রাখেন তো !

মিতুল চৌধুরী

‘মন ভালো নেই, মন ভালো নেই, মন ভালো নেই / কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই !’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বিখ্যাত লাইন দুটি দিয়ে আজকের প্রতিবেদন শুরু করা খুবই সঙ্গত। মানসিক স্বাস্থ্য, আমাদের এই প্রতিবেদনের বিষয়। ধারাবাহিক এই প্রতিবেদনে আমরা আমাদের মনের সমস্ত অন্ধকার কোণগুলো ছোঁয়ার চেষ্টা করব বয়েস, কাল, লিঙ্গভেদে।

ছোটোবেলায় শরীর খারাপ হলে মা-বাবা নিয়ে যেতেন ডাক্তারখানায়, ভালো রেজাল্ট করলে নিয়ে যেতেন বেড়াতে, ডাক্তারখানায় গেলে শরীর ভালো হয়ে যেত , বেড়াতে গেলে মন। কত সহজ ছিল সবকিছু। তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা কী ? আসুন একটু বুঝে নিই বিষয়টা।

দমদমের 'মাইন্ড বাডিজ' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অমিত দে-কে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, এ হেন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হচ্ছে কেন ? আর ‘মাইন্ড বাডিজ’ নামটাই বা কোন বার্তা বহন করে ? আর ওঁর বক্তব্য অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষেরই প্রয়োজন মনের

বন্ধু , যাকে সব কথা খুলে বলা যায় , যে আপনাকে বিচার করবে তার ভাবনা ধারা দিয়ে নয়, সামাজিক প্রেক্ষাপট দিয়ে নয়, বরং সাহায্য করবে আপনার ভাবনা দিয়েই আপনাকে বুঝতে।

অমিতবাবুর কথা অনুযায়ী সময় ও সমাজ খুব দ্রুত গতিতে বদলেছে কয়েক দশকে। তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত বেড়েছে আমাদের মানসিক চাপ। শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেড়েছে মানসিক অসুস্থতা। নাম জুড়েছে ডিপ্রেসন, অ্যাংজাইটি, হাইপারটেনশন, ইনসমনিয়া, স্কিজোফ্রেনিয়া প্রতি ঘরে, প্রতিদিনে। ভুক্তভোগীর তালিকায় শিশু থেকে বৃদ্ধ, পুরুষ থেকে মহিলা, উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত থেকে নিরক্ষর কেউ বাদ পড়ে না ।

প্রত্যেকের অনুভূতি আলাদা, মানসিক অভাব আলাদা, ভোগান্তি আলাদা, কিন্তু একটা জায়গায় সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, মন ভালো নেই, মন ভালো নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারে, এমনকি আপনার নিজের কাছেও, গুরুত্ব পায় না মানসিক স্বাস্থ্য। অনেকটাই অজ্ঞানতা, চিহ্নিত করার অভাব, অসহায়তা, নিজের মানসিক অস্থিরতা নিজের কাছেই স্বীকার না করতে পারা কিংবা সৌখিন সমস্যার বিড়ম্বনা। কিন্তু তাতে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি থেমে থাকে না। রোজ একটু একটু করে বেড়েই চলে। তাই বেড়ে ওঠে আত্মহত্যার হার, নেশায় আসক্ত হওয়ার সংখ্যা, বিক্রি বাড়ে স্লিপিং পিল আর অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ ড্রাগের ব্যবহার । আমাদের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন যাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চায় তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারা হল আজকের প্রজন্ম , যারা এই মুহূর্তে বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে।

বয়ঃসন্ধি নিজেই মানবজীবনের একটি চিরকালীন জটিল ও মানসিক টানা পোড়েনের আঁতুড় ঘর। যাকে আমরা অ্যাডোলেসেন্স বলি, মনে করি ১২-২২ এই এর সীমাবদ্ধতা। কিন্তু মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলছেন, বয়ঃসন্ধির মানসিক স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে তবে তার প্রভাব পড়তে পারে আপনার কেরিয়ারের ওপর, প্রভাবিত হতে পারে আপনার দাম্পত্য এবং আপনার ব্যক্তিত্ব, এমনকি আপনার সারাজীবনের ঘুম, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদযন্ত্রও। আপনার অ্যাডোলেসেন্স আপনাকে ধাওয়া করতে পারে আমৃত্যু, অবাক হচ্ছেন ? একবার নিজের অন্তর মহলে হাতড়ে দেখুন না...

আপনি আজকাল ভীষণ অবাক হন, আপনার চিরকালীন বাধ্য মেয়েটা হটাৎ এত অবাধ্য হয়ে উঠল কখন ? অথবা আপনার ভীষন হাসিখুশি ছেলেটি হঠাৎই কেমন

যেন চুপ করে গেছে, বেশির ভাগ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে ? বুঝে উঠতে পারছেন না কোথায় ত্রুটি হল। কেন এই দূরত্ব, সবই তো ঠিকঠাক ছিল !

উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভাবে মা তো কত ভালোবাসত, আজ কেন আমায় সহ্য করতে পারে না, আমাকে অপমান করে, আমাকে বুঝতে চায় না ! ছেলেটা ভাবে রোজ রোজ এত প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই শান্তির, নিজের ঘরে লুকিয়ে পড়ি, তাহলে আর বাবা খুঁজে পাবে না। তার এই নতুন পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইতে তার খুব একা লাগে। প্রতিদিন তার শরীর বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে --- যা কাউকে বলার নয়, বোঝাবার নয়। ।

জোড়া অস্কার ভারতের

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

গোল্ডেন গ্লোবের পর এবার অস্কারেও সেরা মৌলিক গানের পুরস্কার জিতে নিয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা 'আরআরআর ' -এর আলোচিত গান 'নাটু নাটু' । যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে জমকালো আয়োজনে অস্কারের ৯৫তম আসরে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। 'বেস্ট অরিজিনাল সং' ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা পায় 'নাটু নাটু' । পুরস্কার জয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে এই গানটি। এই প্রথম কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রের গান অস্কার পেল। ডায়ান ওয়ারেনের 'টেল ইট লাইক আ উইমেন ' , লেডি গাগার 'হোল্ড মাই হ্যান্ড ফ্রম টপ গান মেভেরিক' , রিয়ান্না ও সহশিল্পীদের গাওয়া 'লিফট মি আপ' -এর মতো গানকে পেছনে ফেলে নাটু নাটু এই খেতাব জয় করে নিয়েছে।

এমএম কিরাবানির সুর ও চন্দ্রবোসের কথায় এসএস রাজামৌলি নির্মিত সিনেমার গানটি গেয়েছিলেন রাহুল সিপলিগঞ্জ ও কালা ভৈরব। ২০২২ সালের মার্চে প্রকাশ হওয়ার পর থেকে গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ওভার দ্য টপ (ওটিটি) প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ভারতীয়দের পাশাপাশি বিদেশি দর্শক-শ্রোতাদের কাছেও ব্যাপক সমাদৃত হয় গানটি। অস্কার পুরস্কার গ্রহণের সময় পরিচালক রাজামৌলি ও ভারতীয়দের সম্মানে নিজের সুর করা একটি গান গেয়ে শোনান কিরাবানি।

প্রসঙ্গত, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কালো অফ-শোল্ডার গাউনে মোহময়ী দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যায় রেড কার্পেটে। '৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস'-এর মঞ্চে ভারতের একমাত্র উপস্থাপক ছিলেন তিনি। তাঁর ঘোষণার পরেই মঞ্চে দেখা যায় 'আর আর আর' ছবির গান 'নাটু নাটু'র পারফর্ম্যান্স। তিনি বলেন, 'আপনারা কি নাটু কী জানেন ? যদি না জানেন, তাহলে এখনই জেনে যাবেন।' মঞ্চে সিনেমায় গানের দৃশ্যকেই পুনর্নির্মাণ করা হয়। রাহুল সিপলিগঞ্জ ও কালা ভৈরবের এর লাইভ পারফর্ম্যান্স এবং নৃত্যশিল্পীদের নাচে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গোটা থিয়েটার। পারফর্ম্যান্স শেষে দর্শকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যান তাঁরা। সকলে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান তাঁদের।

২০২৩ সালের অস্কার মঞ্চ যেন ভারতীয়দেরই কব্জায়। বলিউড থেকে লস অ্যাঞ্জেলসে উড়ে গেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। হলিউড সুন্দরীদের পাশে তিনিও এবার ছিলেন অস্কার মঞ্চে ড্রিম গার্ল। অন্যতম উপস্থাপিকা। তাঁর ঘোষণায় মঞ্চে উঠে আসেন জোড়া অস্কার জয়ী ভারতীয় কুশীলবরা। একটা নয় এবার দু' দুটো অস্কার পেয়েছে ভারতীয় ছবি। অনুষ্ঠিত হল '৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস' বা 'অস্কার ২০২৩' বিশ্ব বিনোদন দুনিয়ার অন্যতম বড়ো মঞ্চে ভারতের জয়জয়কার। ডাবল অস্কার এল ভারতে প্রথম 'সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম' বিভাগে 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'-এর হাত ধরে। এরপর যে মনোনয়নের দিকে তাকিয়েছিল গোটা দেশ, সেই আশা পূরণ করে অস্কার পেল 'নাটু নাটু' । 'বেস্ট অরিজিন্যাল সং' বিভাগে এই প্রথম ভারত অস্কার পেল। অন্যদিকে এদিনে অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দেয় এই তেলুগু গানের লাইভ পারফর্ম্যান্স। কোন বিভাগে কারা কারা পেলেন সেরার শিরোপা, রইল গোটা তালিকা –

- সেরা ছবি – 'এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স'
- সেরা অভিনেত্রী – মিশেল ইয়ো (এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স)
- সেরা অভিনেতা – ব্রেন্ড্যান ফ্রেসার (দ্য হোয়েল)

▪ সেরা পরিচালক – ড্যানিয়েল ক্যোয়ান, ড্যানিয়েল স্কিনার্ট (এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স)
▪ বেস্ট ফিল্ম এডিটিং – 'এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স'
▪ বেস্ট অরিজিন্যাল সং – 'নাটু নাটু' (আর আর আর)
▪ বেস্ট সাউন্ড – 'টপ গান: মেভারিক'
▪ বেস্ট অ্যাডপ্টেড স্ক্রিন প্লে – 'ওম্যান টকিং'
▪ বেস্ট অরিজিন্যাল স্ক্রিন প্লে – 'এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স'
▪ বেস্ট ভিস্যুয়াল এফেক্টস – 'অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অফ ওয়াটার'
▪ বেস্ট অরিজিন্যাল স্কোর – 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'
▪ বেস্ট প্রোডাকশন ডিজাইন – 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'
▪ বেস্ট অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম – 'দ্য বয়, দ্য মোল, দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য হর্স'
▪ বেস্ট ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম – 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'
▪ বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচাবেস্ট ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম – 'নাভালনি'
▪ সেরা সহ অভিনেত্রী – জেমি লি কার্টিস (এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স)
▪ সেরা সহ অভিনেতা – কে হুয় ক্যুয়ান (এভরিথিং এভরিহয়্যার অল অ্যাট ওয়ান্স)
▪ বেস্ট অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম – 'গিয়েরমো ডেল টোরোজ পিনোকিও'

লেখা ৯

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত : সিরিজ জয় এবং

প্রসেনজিৎ মজুমদার

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেষ্টের সিরিজে ২-১ জিতে ঘটনাচক্রে ভারত বিশ্ব টেষ্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে গেল। ঘটনার চক্করটা অনেক বড়ো , কারণ ভারত ৩-০ অথবা ৩-১-এ জিতলে এমনিতেই ফাইনালে উঠত। কিন্তু সেটা না হওয়া সত্ত্বেও তারা ফাইনালে গেল। সৌজন্যে নিউজিল্যান্ড , যারা শ্রীলঙ্কাকে শেষ টেষ্টে হারিয়ে ভারতকে যেন ফাইনালে পৌঁছনোর রাস্তা করে দিল। নিজেরা অবশ্য শ্রীলঙ্কার কাছে ১-২ টেষ্টে সিরিজ হারল। পাশাপাশি একদিনের ক্রিকেটে সিরিজ হারল ১-২তে। কিন্তু এই সিরিজ জয়ে যে ব্যাপারটা নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে সবথেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে সেটা হল ভারতীয় পিচ। এই প্রতিবেদনের অন্যতম আলোচনার বিষয়ও এই পিচ। কথা হচ্ছিল সিএবির এক কর্তার সঙ্গে। তিনি বললেন 'ভারতের মাটির চরিত্র বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মোটামুটি আর যাই হোক ফাস্ট বোলিংএর জন্য খুব ভালো এটা বলা যাবে না। পাশাপাশি সত্তর দশকে ভারতে উঠতি পেসবোলারদের সেভাবে উৎসাহ দেওয়া হত না। ফলে যাকে বলে পাটা উইকেট তৈরি হত, যেটা ব্যাটসম্যান সহায়ক। অন্যদিকে তখন স্পিনারদের রমরমা। আর ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও স্পিনটা ভালো খেলতে পারে। ততদিনে দেখা গ্যাছে ভারতের মাটি স্পিনের পক্ষে উপযোগী। ফলে প্রথমদিন থেকেই স্পিনের উইকেট তৈরির চেষ্টা করেছে ভারত। বিদেশি দলকে স্পিনের পিচে ডুবিয়ে মারো।' ওঁর আরও মত ভারতের মূল শক্তি স্পিন। ফলে স্পিনের পিচ ভারত তৈরি করবে সেটায় অন্যায়ের কি আছে। যে

যেখানে শক্তিশালী। যেমন ইংল্যান্ডে সিম, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলিং। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার জন্যই ওরা সিমবোলিং খেলতে পারে। সিমিং ট্র্যাক তৈরি করে। অজি, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটির চরিত্রই এমন যে ওখানে বাউন্স গতি অনেক বেশি ফলে ওদের আসল শক্তি পেস ও বাউন্স হবে এটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব কথা উঠছে কেন ? উপমহাদেশের পিচ নিয়েই বা আলোচনা হয় কেন ? হচ্ছে কারণ ভারতের এই জয়কে বাঁকা চোখে দেখছে হেরো সাহেবরা। শরিক হয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসিও। কেন ভারতে আড়াই তিনদিনে শেষ হবে টেষ্ট। অতএব নম্বর কাটো ভারতের পিচগুলোর। 'কই বিদেশের মাটিতে যখন ফাস্ট বোলিং-এর দাপটে আড়াই তিন দিনে হেরে যায় উপমহাদেশের দলগুলো তখন তো ওদের নম্বর কাটে না আইসিসি?' প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং সুনীল গাভাস্কার। প্রসঙ্গত প্রথম দুটো টেষ্টের পর অফস্পিনার রবিঅশ্বিনকে এক বিমান সহযাত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তিনদিনে খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে কেন ? সময় তো পাঁচদিন। দর্শকের অধিকার তো আছে পাঁচদিন ধরে খেলাটা উপভোগ করার।' হক কথা সন্দেহ নেই। আইসিসি অনেকদিন ধরেই বলছে স্পোর্টিং উইকেট করতে হবে। কিন্তু শুধুই কি উইকেট ফ্যাক্টর? নাকি আরও অন্যকিছু ? জনৈক ক্রীড়া সাংবাদিক জানালেন বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে এই সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া খেলার আগেই পিচ নিয়ে এত কথা বলেছে যে ওদের ফোকাসটাই নড়ে গ্যাছে। যে পিচে ভারত ৪০০ রান করে সেই পিচে ওরা অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ১৭৭ আর ৯১ করে কী করে ? আমি ধরে নিচ্ছি ভারতীয়রা দারুণ বোলিং ফিল্ডিং ক্যাপ্টেনসি উইকেট কিপিং স্লেজিং সহ সব বিষয়ে ভালো করেছে । ২\১টি সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে গ্যাছে। এছাড়াও ঘরের দর্শক একটা ফ্যাক্টর তো বটেই তবুও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা উইকেটে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারল না কেন ? ২\১টা উইকেট ছুঁড়েও যদি দেয় তাহলেও বলব একই কথা। বাকী ব্যাটাররা কী করছিল ? অস্ট্রেলিয়ার বোলিং নিয়েও একই কথা। যে দলে নাথান লিঁওর মতো স্পিনার থাকে সেই দল ভারতকে ৪০০ করতে দিল কীভাবে?' ঠিকই। এই প্রতিবেদকেরও এটাই প্রশ্ন। তাহলে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটীয় ব্যর্থতার সমালোচনা হবে না কেন ? এর উল্টোটা ভাবুন। ভারত যদি অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ফাস্ট উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার পেস অ্যাটাকের সামনে তিনদিনেই আত্মসমর্পণ করত তাহলে অজি মিডিয়া কি ওদেরপিচের দোষ দেখত , নাকি ভারতকে নিয়ে খিল্লি করত ? দ্বিতীয় টেষ্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া বরং ২৬৩ রান করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রানে অসহায় আত্মসমর্পণ। ফলে হার। এর দায় কে নেবে? অস্ট্রেলিয়ার

খেলোয়াড়রা নেবে না ? আর তৃতীয় টেষ্ট ? ভারত হেরে গেল ! অর্থাৎ যতই লো স্কোরিং ম্যাচ হোক না কেন, ভারতকে হারিয়ে অজিরা দেখাল ঠিকমতো নিজেদের প্রয়োগ করলে ভারতের মাটিতে স্পিনের পিচে জেতা যায়। এ-প্রসঙ্গে জানাই মোহালি ও মোতেরার পিচ একসময় আইসিসির রোষে পড়েছিল এবং 'আন্ডার-প্রিপেয়ার্ড' পিচের তকমাও পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐসব পিচে লোস্কোরিং ম্যাচও হয়েছিল। প্রসঙ্গত মোহালীর পিচ কিন্তু জোরে বোলারদের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। ভারত নব্বই দশকে একবার ফাস্ট বোলিং-এর পিচ বানিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজেরকাছে হেরে যায়। পিচ ব্যাক ফায়ার করেছিল। ফলে পিচ টেষ্টক্রিকেটের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বইকি। পিচ শুধু টেষ্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয় , একদিনের ম্যাচের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে জানাই, গত দশকে কানপুর আইআইটি থেকে ভারতের মাটি পরীক্ষা করে বলা হয়েছিল এদেশে ফাস্ট বোলিং-এর পিচ চট করে করা মুশকিল। এখন মূলত পাটা উইকেটই তৈরি হয় একদিনের ক্রিকেটে। আর তাতেই বিশ্বের এক নম্বর দেশ ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে কুপোকাত। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে যে পিচে ভারত ছাব্বিশ ওভারও টিকল না, ১১৬ রানেই অলআউট, সেই পিচেই অস্ট্রেলিয়া মাত্র এগারো ওভারে তুড়ি মেরে বিনা উইকেটই রানটি তোলে। তাহলে পিচ, না ব্যাটারদের নিজেদের প্রয়োগ করার ক্ষমতা --- কোনটা গুরুত্বপূর্ণ ? চার দশক আগে যখন পিচ ঢাকা থাকত না , তখন চল্লিশ ওভারের ক্রিকেটে টসে জিতে পরে ব্যাট করাটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন টেস্ট ও একদিনের খেলার পিচে সেই অর্থে বিরাট কোনো ফারাক থাকত না। স্পিনাররাও নরম স্যাঁতস্যাঁতে পিচের সুবিধা পেতেন। চল্লিশ ওভারে দুশো রান ও পঞ্চাশ ওভারে আড়াইশো রান বড় রান বলে গণ্য হত।তথ্যটি দিলেন বাংলার এক প্রাক্তন খেলোয়াড়।

কিন্তু এবার গুজরাটের মোতেরা অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে যা ঘটল তা উলটপুরাণ। হারের ভয়ে ভারত বানাল পাটা উইকেট। উঠল ঝুড়ি ঝুড়ি রান। তার মানে নিজের দেশের স্পিনের পিচে ওভার ত নিরাপদ নয়। অতএব পাটা উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল ৪৮০ রানে। ভারতের ৫৭১ । তাও শ্রেয়স আয়ার ব্যাট করেননি। এটা যেহেতু টেষ্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা তাই ঝুঁকি নেয়নি ভারত। কারণ, এই টেষ্ট হারলে চলত না। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার খেলার ফল খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীলঙ্কা জিতলেই ভারতের ছুটি হয়ে যেত। কিন্তু ভারত যদি ৩-০তে এগিয়ে থাকত তাহলে হয়ত ভারত ৪-০ ম্যাচে জেতার জন্য স্পিনের উইকেট বানাত এবং হারলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। ৩-১এ সিরিজ জিতলে অন্যদিকে শ্রীলঙ্কাও যদি জিতত তাহলেও ভারতের ফাইনালে যাওয়া আটকাত না।

সে যাই হোক, মোতেরার পিচ এমনই হল যে কারো কারো মতে ‘টাইমলেস' টেষ্ট খেলার জন্য আদর্শ।আমরা কোনো মত দেব না। তবে বিরাট কোহলি নিশ্চয়ই মনে রাখবেন এই পিচকে, কারণ সাড়ে তিন বছর পর সেঞ্চুরি করলেন। আর যে সে সেঞ্চুরি নয় , একেবারে ১৮৬ রান বলে কথা। জনৈক সমর্থকের মতে এমন কোনো উইকেট বানানো উচিত নয় যেটা আড়াই দিনে শেষ হবে আবার এমন উইকেট করাও ঠিক নয় যেখানে টাইমলেস টেষ্ট খেলা যাবে। মনে রাখতে হবে টেষ্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে কিন্তু সীম বোলিংএর জায়গা ইংল্যান্ডে। জুনের খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে স্পোর্টিং পিচ। গতবারের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হার ভারত নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। অতএব সাধু সাবধান।

লেখা ১০

কলকাতায় শুরু হল ডায়াহোমের যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতায় সল্টলেকে ডায়াবেটিসের উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন চিকিৎসার জন্য উদ্বোধন হল চেন্নাইয়ের এ রামাচন্দ্রস্ হাসপাতালের সহযোগিতায় পূর্ব ভারতের একমাত্র ডায়াবেটিস হোম কেয়ার ইউনিট ডায়াহোম ও সেই সঙ্গে ডায়াহোম অ্যাপের। ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় সল্ট লেক রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে এই উনিটের উদ্বোধনের পর ছিল একটি সেমিনারের আয়োজন। ডায়াবেটিস নিয়ে এই সেমিনারে অংশ নেন প্রখ্যাত ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা অরুন রাঘবন, ডা নন্দিতা অরুন, ডা সৌম্যজিৎ ঘোষ এবং ডা দেবারতি ভড়। সেমিনারের পর ছিল ডায়াবেটিস নিয়ে সাধারণ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রশ্নোত্তরের আসর। প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা।

অনুষ্ঠানের শেষে ডায়াহোমের সিইও আশিস পন্ডিত জানালেন সল্ট লেক সি ই ১৭ ঠিকানায় ৫ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ডায়াহোমের আউটডোর পরিষেবা।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন